আশ্রয়

অরণি বসু

যেদিনই আপনার বাড়িতে যাই ঝাঁক ঝাঁক তির ছুটে আসে-
যেমন সমুদ্রের ঢেউ, আছড়ে আছড়ে পড়ছে পাড়ে।
কতত লোক আসে এ বাড়িতে
কে যে কখন সাঁকো নাড়িয়ে দিয়ে যায় যে জানে-
সেই নাড়া খাওয়া সাঁকোর ঝাপটা সহ্য করতে হয় আমাকে,
যে বঞ্চনার সুদুরতম কোনও দায় নেই আমার
তারও ঝাপটা সহ্য করতে হয় আমাকেই।
চুপ করে থাকব ভেবেও মাঝে মাঝে আমিও শান দিই জিভে,
বিষণ্ন নদীর পাশে আদিগন্ত বালির চড়ায় ঝনঝনানির শব্দ হয়।
এ শুধু আপনার বাড়ি নয়, আপনাদের বাড়ি।
আরেকজন প্রাচীনতম পাহাড়, চুপ করে শুনে যান সব,
হইচই খুব বেড়ে গেলে অস্ফুটে চেষ্টা করেন থামবার,
এই অকারণ তকরার।
সাঁকো আস্তে আস্তে স্থির হয়ে যায়
আমরা সান্ধ্যকালীন চা পান করি। রসগোল্লাও খাই কোনও কোনও দিন।

ঝড় ওঠে, ঝড় শান্ত হয়ে যায়
পাহাড়ে সাগরে মেশামেশি হয়ে সে এক আশ্চর্য মৌতাত পঞ্চলিঙ্গেশ্বর।
আমি পাহাড়ের গায়ে ঠেস দিয়ে সমুদ্রকে স্পর্শ করে
আলাভোলা হয়ে বসে থাকি অনন্তকাল।

অমূল্য আঢ্যর দিব্যজ্ঞানোন্মেষ
প্রবালকুমার বসু

অনেক তপস্যা, সাধ্যিসাধনার পর
অমুল্য আঢ্য শেষমেষ ঈশ্বরের দেখা পেল
ঈশ্বর জিজ্ঞাসা করলেন – কী বর চাও?
মাথা চুলকে ঢোঁক গিলে, হাত কচলে অমূল্য বলল
স্যর, একটু ভাল থাকতে চাই

এরকম একটা সম্মোধনে ঈশ্বর সামান্য হকচকিয়ে গেলেও
দ্রত সামলে নিয়ে বললেন–
বেশ তাই হবে। আর অভয়ের হাত বুলিয়ে দিলেন অমূল্যর মাথায়

জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে অমূল্য ঈশ্বরের দিকে চাইতেই তিনি বললেন
তোমার বুদ্ধির কিছুটা অংশ সরিয়ে নিলাম
ভাল থাকবার প্রাথমিক শর্ত এটাই–
একটু একটু বোকা হয়ে যাওয়া

বিষাদ
অভিক মজুমদার

লাল হল মধ্যরাত। প্রলয়ের সতর্কতা নিয়ে
তুমি এলে। গানে তুমি এলে।

বজ্রপাতে দেখি চোখে কাজল পরোনি। না-জানিয়ে
এসেছ বলেই কিন্তু এত বৃষ্টি। অথচ বিকেলে

রোদ ছিল। ঘাম ছিল। পথে শব্দ ছিল।
দেহ দিই। ব্যাকুলতা দিই। কাঁকনে চুম্বন দিই গাঢ়।

ছটফটে আদর গড়ি। ঝড় খুলি। খিলও।
নভোমঞ্চে দাপাচ্ছে পাগল।

বজ্র জ্বালো। দ্রুত বজ্র জ্বালো। আবার, আবারও...

একি দেখি, দু'নয়নে জল?

তিন তিনটি বাঘ
বাঘ, সার্কাস দলের
টোকন ঠাকুর

সার্কাস দলের বাঘ, সে শিক্ষানবিশ
সে দর্শকপ্রিয়, সে জাতীয় তারকা। যদিও, তাকে ভালবাসে খাঁচা
খেলাচ্ছলে
উস্তাদের চোখে চোখ রেখেই তার বাঁচা; তলে তলে
বাঘের দুচোখে তখনও ঘন জঙ্গলের স্মৃতি
বাঘিনীর জন্য মায়া, স্নেহ, প্রেম
কিংবা যতটুকু
পুনশ্চ শিকারের গুপ্ত সংকেত
সার্কাস প্যান্ডেল থেকে বেরিয়ে, এইটুকু চিত্রকল্পই কি নয় যথেষ্ট উদ্ধৃতি?

<u>বাঘ, সুন্দরবনের</u>
গেলাম সুন্দরবনে, গোলপাতা, মেহগনি... গাছেরা সুন্দরী
পাইনি বাঘের দেখা, ক্যামেরায় অগত্যা হরিণী-টরিনিই ধরি।
আর শহরের ক্যানভাস ছেড়ে এসে, ইনস্টলেশন-ক্যাম্প করি
আর দিনের দুপুরবেলায় শুনি ঘাইহরিণীর ডাক
কোথাও অনেক বনে – যেইখানে জ্যোৎস্না আর নাই, কোথাও হরিণ আজ হতেছে শিকর
বনের ভিতরে আর শিকারিরা আসিয়াছে
তারা কারা ? আদিগন্ত আত্মমগ্ন, অনর্থক সৃজনশীল, ভাবনা-সন্দেশে শঙ্খচিল
যেমন আমি, বাঘ দেখতে গিয়ে দেখি – কোথাও বাঘের পাড়া বনে আজ নাই

<u>বাঘ, সুন্দর মনে</u>

এই নিউ এলিফ্যান্ট রোডে পাশে, সোডিয়াম রাজনীতি
এই কলোনিমুখর অন্ধকারে নিদ্রাহীন, গীতিনাট্যের মহড়া করে আফিম উদ্যান;
আমার ঘরেই সুন্দরবন, বাঘের পোস্টার, কারুশিল্পের কাঠের হরিণী
ঘরের দেয়াল জুড়ে জুড়ে কত কত গান-গল্প-কবিতা কুয়াশা আর জ্যোৎস্নাকবলিত
চরাচরের ফটোগ্রাফি
কিন্তু আমার তো ঘুম আসে না,
ঘুম ভয়ে পালিয়ে বেড়ায় আর পলাতক ঘুমের মায়ায়
কার-না-মুখে পড়ে মহাকাশ-চর্চিত দাগ?

ওঃ কী নিঃশব্দে থাবা মারে, ভয়ঙ্কর (ম্যানগ্রোভ কি নয়) সুন্দর মনের বাঘ?

ভাস্কর্য
কুন্তল মুখোপাধ্যায়

এভাবে হবে না, শোনো, রাত্রিবেলা সাপ হয়ে এস
ঘামের গন্ধ তো চেনো, হিরন্ময়, চেটে নিও, বেশ?
মস্তকই তোমার লক্ষ্য অথবা ঘুমন্ত গ্রীবাদেশও
বিষ ভরে দিতে পারো, দেখো সেও শিরায় শিরায়
ছুটে চলে তীব্র বেগে অন্ধকার ভিতর টানোলে
যেভাবে তরুণ ট্রেন ধানমাঠ চিড়ে চলে যায়...
এভাবেও নয়? তবে পেটে হাত ভরে দাও ঠুসে
ছিঁড়ে দাও চামড়া দেখো শুয়ে আছে মৃদুল বৃক্কেরা
আরও যাও। পাবে ঘাস, শ্বাসকষ্ট ম্লান ফুসফুসে...

নাভিবিন্দু থেকে চামড়া দড়ি দিয়ে বাঁধো গদ্যকার
টাঙিয়েছ? আহা খুনও কী শিল্পসম্মত হতে পারে।

রূপের ভেতরে রাস্তা
সংযম পাল

১
সে ছোট কুরুর সেই ভিখারির পরিবারে
সদহ্য হয়েছে।
লাঠি তুললে খ্যাঁক খ্যাঁক করে।
যখন হোটেল থেকে বাসি রুটি আসে,
সে শুধু অপেক্ষা করে অতিথির মতো।
নরম এ প্রমাকুল বাংলা কবিতা
তাকে জায়গা দিতে পারছে না।
অথচ সে ছোটন কুকুর
ভিখারির পরিবারে এক চিলতে জায়গা করে নিয়ে
লাঠি দেখে এক পা নড়ছে না।
২
বারান্দা ঘরে অংশ,
বাইরেরও অংশ হয়ে আছে?
আমি যে ঘরের মধ্যে
বড় বাবা কান্ড শেকড়,
বাইরে বেরলে এক

পরমে কুসুম।
তোমাকেও টেনে বার করি,
পার্থক্য ঘোচাতে।
৩
পাখি জুতো পরে হাঁটে ছাদের কালোয়।
শালিক হলুদ ঠোঁটে ক্রি-কিরিক্ করে।
অর্ধেক ছায়ায় ঢাকা, অর্ধেক আলোয়।
কাস্টমস পেছনে পড়ে থাকে।

মাগারাম ধীবর
নয়ন রায়

সকাল সকাল দুটো চারাপোনা হাতে করে আসত বাড়ি
মা চা আর রুটি দিত মাগাদাকে। মাকে খুড়ি সম্বোধন
করে বলত এই মাছ দুটো ভাইকে দিবেন, ভেজে খাবে
বাবা পাঞ্জাবির পকেট থেকে টাকা বের করে দাম দিতেন।

সেই দাম নিয়ে মাগারাম গাঁজা খেত রোজ। আমাদের গ্রামে
ওর মামাবাড়ি। কার পুকুরের মাছ আনত কেউ জানত না।
হয়তো আমাদের পুকুর থেকেও হতে পারে। আমাদেরই দিয়েছে
কোনও কোনও দিন ব্যানার্জিপাড়ায় নিতে যেত মাছ কখনও হয়তো...

মাগারামের পকেটে থাকত ধুতরো ফল, কখনও সাপ
ধরে রাখত কোঁচড়ে। চিতি সাপের কামড়ে কিছুই হত না ওর
এক অদ্ভুত চরিত্র। দেখা হলেই বলত দেববতারা প্রণাম লেন
দেবতা মানে পৈতেধারী যে-কেউ হতে পারে। প্রণাম নেব?

ভয়ে কেউ কাছে ঘেঁষতাম না। কখন সাপ বের করে গলায় ঝোলাবে
ভয়ে তটস্থ তাকতাম পাড়ার ছেলেরা। আজও মাগারাম তেমনই আছে
বয়স বেড়েছে মাঝে মাঝে কোথাও উধাও হয়ে যায়
আবার ফিরে আসে। সেই এক ডাক দেবতারা...

বাবা গত হয়েছেন তাই আমাদের বাড়িতে আর মাছ আনে না
মাগারাম। ভাঙ, ধুতরা, গাঁজা সঙ্গী করে-বর্ণময় মাগারাম।
কার পুকুর থেকে মাছ ধরে – কেউ জানবে না কোনওদিন
মাগারাম ধীবর মাছের আত্মার খবর রাখে প্রতি রাতে...

পোড়া শহর

জয়ন্ত দেবব্রত চৌধুরী

এই ব্যস্ত শহরের বুকের ভেতরেও একটা নির্জন গ্রাম আছে
যেটা কোনও মানুষের নয়, যেটায় কিছু কেঁচোর নিবিড় বসতি
বিবর্ণ মাকড়সার জাল, পিঁপড়ের বাসা আর অল্প ইউয়ের ঢিবি
কাঠের গোঁজে সাদাবুকে বসা আত্মমগ্ন এক মাছরাঙার আস্তানা
অথবা কোজাগরী কোনও লক্ষীপেঁচার বিনমান লুকোচুরির ঠিকানা
এই শুকনো শহরের ভেতর কয়েকটা লুকোনো প্রাচীন দিঘি আছে
যেগুলো মৎস্য আর কূর্ম অবতারের, তুখোড় ডুবসাঁতারু পানকৌড়ির
জলের অন্তরে মগ্ন রাজ্যে নয়ছয় যায় রহস্যসিন্দুকে কত অবাধ গুপ্তধন
যে-নগরীর শেষ চোরানকশা গিলে ফেলেছে শ্যাওলা-ধরা রাঘববোয়াল
জলকন্যার মুক্তামালা আজও যক্ষ হয়ে পাহারায় অনুগত নৌকার কঙ্কাল
এই নতুন শহরের মাঝেমধ্যে একটা দুটো পুরনো জারুলগাছ আছে
যেটা শুধুই বাগবাজারে বৈশাখের দীর্ঘ দুপুরে বেনেবউ আর দোয়েলের
গভীর রুতে গাছের মাথায় দিঘল পায়ে ঘুরে বেড়ান অতন্দ্র বনদেবতা
চোখ-না-ফোট পাখির ছানাকে সর্পকুলের তপ্তশ্বাস হতে রক্ষা করতে
এই ধূসর শহরের আনাচেকানাচে কয়েকটা কালচে-সবুজ বন আছে
যেটা রুগ্‌ণ ঘোড়াদের আরোগ্যভূমি, জরাজীর্ণ অথর্ব অশ্বত্থের সমাধিস্থল
জ্যোৎস্নারাতে ঐরাবতের দল এসে দাপিয়ে বেড়ায় পাতামোড়া জাদুজঙ্গল
মহাকাল মহাবটের গুঁড়িতে বৈর্য ভরে আঁকেন কত সাঙ্কেতিক মুখোশ
এই রোদে পোড়া শহরের বুকে পাতা হাতেবোনা একটা শীতলপাটি আছে
যেটায় শুধু কাঙাল কুকুর, বোবা বেড়াল আর গরিব গাছেদেরই অধিকার।

চিলেকোঠা
সুজাতা রায়

এখনও খুঁজলে পাবে
প্লাস্টিক পুতুলের পা
ভাঙা কম্পাস আর
সুলেখা কালির দোয়াত।
যে-জানলার হাত চিপে লাল রক্ত কালো হয়েছিল,
সেটাও তেমনি আছে। আর আছে প্রথম চুম্বন, নিষিদ্ধ পরশ যত দেওয়ালের কোনো আটকে আছে, এর ঘরে ফ্যানের শব্দে
লাবডুব লাবডুব বাজে। দরজা খুললে এখনও দগ্ধ দুপুরের গন্ধ পাবে।
নির্জন দুপুর জেনো
রাত্তিরের চেয়ে কম নয়, চিলেকোঠা সাক্ষী দেবে দুপুরের হাত ধরেই কৈশোর যৌবনে পৌঁছয়।

ঘৃণা
মৃন্ময় ভৌমিক

জলের তল পাওয়া কঠিন, শেষ নেই ওঠাও পাহাড়ে
চশমা নিজেও জানে না, তোখ কত হিংস্র হতে পারে
নেলপালিশ আজও বোঝেনি, নখ কী জিনিস
তই-বা কতটুকু আমাকে...

বোঝার উপায় থাকে না, এমন সাজুগুজু করে রাখা
সব চুল বাঁধা থাকে খোঁপায়। কে কাকে ধরবে বন্দুক
কে কাকে ধর্ম দিয়ে কোপায়। জানে, কাকুতিমিনতি
দুই বোন আর রেস্তরাঁ। মাথার জন্য মাথা কোটে শরীর
হাতের দুঃখে কেঁদে ওঠে পা।

কেউ মনেই রাখে না এত, পাশ কাটিয়ে চলে যায়
বোম খোঁজা কুকুর-বেবি ফ্রক-লাশ
রক্তের মতো ধুয়ে দাও, আমার ধর্মের বিশ্বাস।

মা

রূপক গোস্বামী

মায়ের সাথে আমার বেশি কিছু গল্প নেই
আমি ঘুম থেকে উঠে মাকে বিছানায় দেখতাম না
ঘুমোতে যাওয়ার সময় মাকে বিছানায় দেখতাম না
বাসনের বা জলের বালতির শব্দে মা থাকতেন
এবং মা শব্দের মধ্যেও মা থাকতেন
কেননা যা কিছু ভ্রষ্ট তাকে শিষ্ট করবার জন্য
তার অনিবার্য প্রয়োজন হত।

এখন, যখন শরীর আর প্রলাপ নিতে পারে না
অথবা তুমিও ফিরিয়ে দাও যথেষ্ট অকারণে
তিনি আমায় ঘুম পাড়িয়ে দেন
ঘুম থেকে তুলে ছুটি নিতে বলেন
সওয়া বারোটার ঘড়ি হয়ে বসে আমায় ড্যানায় তেল মাখিয়ে দেন
আর বলেন – প্যাটটা অ্যাক্কারে শুকাইয়া গ্যাছে,
যা, যোবা ষইষ্যা স্নান কর, আমি ভাত বাড়ি।
ফিরে দেখি কাঁসার বাটিতে মায়াব্যঞ্জন সাজিয়ে মা
মুঠো মুঠো গল্প তৈরি করছেন, তাদের নাম দিচ্ছেন,
আর অষ্টোত্তরশতনাম তার দিস্তা দিস্তা পান্ডুলিপি হয়ে
উড়ে যাচ্ছে দুর্গানগরের আকাশে